প রি ক্র মা

‘সঙ্ঘশক্তিঃ কলৌ যুগে’

ভগবান বেদব্যাস বলেছেন, ত্রেতাযুগে মন্ত্র-শক্তি, সত্যযুগে জ্ঞানশক্তি, দ্বাপরে যুদ্ধশক্তি আর কলিতে সঙ্ঘশক্তি কার্যকরী। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবৎকালের শেষদিকেই কলিযুগের সূচনা হয়ে গিয়েছে। ভারতবর্ষে বৈদিক পরম্পরা সঙ্ঘ দেখেনি। একাধিক সন্ন্যাসীর একত্র অবস্থানই নিন্দিত সেখানে। একত্রিত দুজন সন্ন্যাসীর পারিভাষিক নাম ‘সন্ন্যাসিমিথুন’, তিনজন সন্ন্যাসী—‘সন্ন্যাসিগ্রাম’, চার ও ততোধিক—‘সন্ন্যাসিনগর’। এসবই অত্যন্ত নিন্দনীয়। কিন্তু কলিযুগের দুই সন্ন্যাসি-শিরোমণি—কলির চরিত্র অনুধাবন করেই নিশ্চয়—গড়ে তুলেছেন সন্ন্যাসিসঙ্ঘ। ভগবান বুদ্ধ এবং স্বামী বিবেকানন্দ। বেদের ঋষি ‘সর্বভূতেষু চাত্মানম্’ অনুভব করেছেন, বিশ্বকে হৃদয়ে ‘একনীড়’ করেছেন, বসুধাকে কুটুম্ব করেছেন, কিন্তু একত্র হয়ে আপামরের শান্তিকল্যাণ সম্পন্ন করেননি। গীতামুখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জানিয়ে গিয়েছেন—যারা সর্বভূতহিতে রত তারাই মোক্ষের অধিকারী, যে-মানুষ সর্বভূতের প্রতি ‘মৈত্রঃ করুণঃ’ সে-ই তাঁর প্রিয়, কিন্তু মোক্ষ ও ঈশ্বরপ্রীতিলাভের চেষ্টা যে অনেকে মিলে করতে হবে যাতে সকলের হিত হয়, সেকথায় বোধ করি সেযুগের প্রয়োজন ছিল না।

যুগান্তর এনে দিল ভিন্ন একটি পরিস্থিতি। ত্রিতাপদগ্ধ মানুষের দুঃখমুক্তির জন্যই মহাপ্রাণ বুদ্ধের সংসারত্যাগ, সাধনা। বোধিলাভের পর সে-মহাবার্তা সকলকে জানাতে চাইলেন তিনি। তাই প্রয়োজন হল এমন একদল মানুষের যাঁরা প্রীতির সঙ্গে সেকাজ করবেন। একইসঙ্গে, সংসারের আকর্ষণ থাকলে তাঁরা বহুর কল্যাণে সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করতে পারবেন না বলে তাঁদের সংসারত্যাগীও হতে হবে। তথাগতের দৃষ্টিতে জগৎ ‘মার’-এর ঐশ্বর্য, যা সর্বথা পরিত্যাজ্য। এই পরিস্থিতিতে বুদ্ধদেবকে কেন্দ্র করে সঙ্ঘের সৃষ্টি।

উনিশ শতকে শ্রীরামকৃষ্ণ উপলব্ধি করেছিলেন, তাঁর নিজের জীবনে প্রকাশিত ‘মহদুদার’ ভাব সমগ্র মানবজাতির সম্পদ—তার সুষ্ঠু সংরক্ষণ ও বিতরণের জন্য নতুন একটি সঙ্ঘ প্রয়োজন। তার অন্তর-বাহির কেমন হবে, সেই উভয় বিষয়ই প্রিয়শিষ্য নরেন্দ্রনাথ—ভবিষ্যতের স্বামী বিবেকানন্দের কাছে ব্যক্ত করে গিয়েছিলেন তিনি। স্বামীজীর দেখার চোখ স্বতন্ত্র। ভারত পরিব্রাজনের সময় তিনি বুঝলেন, কয়েক লাখ সাধু ভারত জুড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন—মহুয়ার ফুল খেয়ে বেঁচে-থাকা কোটি কোটি মানুষের থেকে ভিক্ষা নিয়ে। যাদের অন্নে প্রাণধারণ, তাদের দেহমনের সেবা করতে হবে বই কী! নইলে যে বিশ্বাসঘাতকতা হয়! এই বিশাল সাধুসমাজের শক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। সাধুদের পিছুটান নেই—সমস্ত সামর্থ্য, সমস্ত সময় তাঁরা দিতে পারবেন মানবদেবতার চরণে। আর এই কল্যাণপ্রকল্প কার্যকরী হবে সঙ্ঘের মাধ্যমেই।

কেবল একটি দ্বিধা স্বামীজীর মনে ছিল যে, সঙ্ঘের ধরাবাঁধা নিয়মের মধ্যে চিন্তার স্বাধীনতা নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু শেষপর্যন্ত তিনি দ্বিধামুক্ত হন, কারণ ‘সঙ্ঘ ব্যতীত কোনও বড় কাজ হতে পারে না।’ চিঠিতে চিঠিতে লিখে চলা স্বামীজীর নির্দেশগুলি ছিল সঙ্ঘের পথচলার দিক্‌চিহ্ন : ‘‘সব বিষয়ে আজ্ঞাবহতা শিক্ষা কর... গুরুজনদের অধীন হয়ে না চললে কখনই শক্তি কেন্দ্রীভূত হতে পারে না।... ঈর্ষা ও অহংভাব তাড়িয়ে দাও—সঙ্ঘবদ্ধ-ভাবে অপরের জন্য কাজ করতে শেখো।’’

তিরিশের কোঠায় সদ্য পা-রাখা তরুণের অভ্রান্ত বাস্তববোধ, তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টি! সঙ্ঘের সঙ্গে থাকবে না রাজনীতির লেশমাত্র সংস্রব। জনগণের থেকে

গৃহীত অর্থের পাইপয়সার হিসেব রাখতে হবে, শাকের কড়ি মাছে দেওয়া যাবে না। প্রচারের দ্বারাই সম্প্রদায়ের জীবনীশক্তি বলবতী থাকে, তাই প্রচার অব্যাহত থাকবে। বিদ্যার চর্চা থাকতেই হবে—নইলে ধর্মসম্প্রদায় নীচদশা প্রাপ্ত হয়। শাস্ত্রকে মিলিয়ে নিতে হবে জীবনের সঙ্গে। স্বামীজী ইতিহাসের সমনস্ক ছাত্র। বৌদ্ধ ইতিহাসের পর্যালোচনায় তিনি অনুধাবন করেছিলেন, নবীন ভাবাদর্শ শুধুমাত্র স্থানীয় ভাষায় লিপিবদ্ধ হলে পায়ের তলায় শক্ত মাটি পাবে না। বিশেষত ভারতবর্ষে দেবভাষা-গ্রথিত শাস্ত্রসম্পদকে উপেক্ষা করে কোনও সম্প্রদায় মর্যাদা তথা শক্তি পায় না। তাই শাস্ত্রের পঠনপাঠনকে স্বামীজী খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁদের বরানগর মঠবাসের সময় বিবিধ বিষয়ে পড়াশোনার ব্যাপ্তি দেখে স্তম্ভিত হতে হয়।

বিদেশের মাটিতেই ছকা হয়ে গেল স্বামীজীর যাবতীয় পরিকল্পনা। "Organisation শব্দের অর্থ division of labour—প্রত্যেকে নিজের নিজের কাজ করে এবং সব কাজ মিলে একটি সুন্দর ভাব হয়।" মানবশরীরে যেমন প্রতিটি অঙ্গ আলাদা আলাদা কাজ করে অথচ সব-কটি অঙ্গ মিলে একটি দেহ—একটি একক—সঙ্ঘের ক্ষেত্রেও তাই। এই সঙ্ঘ শ্রীরামকৃষ্ণেরই শরীর—সঙ্ঘের সদস্যগণ তাঁরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।

সন্ন্যাসিসঙ্ঘের বৈশিষ্ট্য সাম্য। ভগবান বুদ্ধ সব বর্ণের মানুষকেই তাঁর সঙ্ঘভুক্ত করেছিলেন। সমাজের সকল স্তরের মানুষ তাঁর করুণায় আত্মহারা হয়ে সঙ্ঘে যোগ দিয়েছিল। সূর্যের মতো তিনি আলোক বিতরণের ক্ষেত্রে পাত্রবিচার করেননি; বরং অক্ষম সন্তান যেমন মায়ের স্নেহ বেশিমাত্রায় আকর্ষণ করে, তেমনি আপাত-অযোগ্য মানুষের প্রতি তাঁর করুণা অপ্রতিহত বেগে প্রকাশিত হত। তাঁর কৃপায় সঙ্ঘে স্থান পেয়েছিলেন চণ্ডাল শীলবান, ক্ষৌরকার উপালি, এমনকী দস্যু অঙ্গুলিমাল। অবশ্য পরবর্তী কালে সমাজের অসন্তোষকে মেনে নিয়ে দস্যু, কারা-পলাতক বন্দি, সৈনিক প্রভৃতির সঙ্ঘভুক্তি তাঁকে নিষিদ্ধ করতে হয়েছিল। এযুগে সকল ধর্ম-বর্ণ ও সর্বস্তরের মানুষ যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা লাভ করেছেন, তেমনি তাঁর নামাঙ্কিত সঙ্ঘকেও স্বামীজী কোনও বিশেষ ধর্ম-বর্ণের কুক্ষিগত করে রাখেননি।

'চরথ ভিক্খকবে চারিকং বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়'—বহু মানুষের কল্যাণের জন্য ভিক্ষুদের প্রতি সর্বত্র বিচরণের নির্দেশ ছিল ভগবান বুদ্ধের। সে-নির্দেশ শুধু পারমার্থিক নয়, ঐহিক কল্যাণেরও। তাই ধর্মোপদেশ ছাড়াও ভিক্ষুসঙ্ঘের কাছে মিলত সেবাশুশ্রূষা, ওষুধপত্র। লিচ্ছবিদের রাজ্য বৃজি, তার রাজধানী 'মর্ত্যের স্বর্গ' বৈশালী। সেখানে একবার দুর্ভিক্ষ হলে বুদ্ধদেবের আদেশে ভিক্ষুরা গিয়ে সেবাকার্যে প্রাণপাত করেছিলেন। তাঁরা আরোগ্যশালা খুললেন, রাস্তাগুলি পরিচ্ছন্ন করে চুন ছড়িয়ে দিলেন, নিকাশি নালাগুলি জল দিয়ে ধুয়ে দিলেন, জমে থাকা আবর্জনা পুড়িয়ে দিলেন, অসুস্থদের ওষধি দিলেন। স্বয়ং শাস্তা রোজ নগরে গিয়ে পীড়িতদের সেবা করতেন। এজন্য সঙ্ঘ জনসমাজের আস্থা ও শ্রদ্ধা লাভ করেছিলেন। এ-চিত্র আমাদের মনে করিয়ে দেয় বহু শতাব্দী পরের মর্মস্পর্শী ঘটনাবলি। প্লেগ-মহামারি কবলিত কলকাতা মহানগরীর করুণ বর্ণনা শুনে, শৈলাবাস দার্জিলিং ছেড়ে অসুস্থ স্বামীজীর কলকাতায় ছুটে আসা, সেবার অর্থের জন্য বেলুড় মঠের জমি বিক্রি করে দেওয়ার ইচ্ছা, প্রাণের মায়া ছেড়ে তাঁর শিষ্যদের সংক্রামক রোগীর সেবা, মেথরদের ধর্মঘট অগ্রাহ্য করে পয়ঃপ্রণালী পরিষ্কার, এমনকী হতদরিদ্র বস্তির ঘরের নোনা-ধরা দেওয়ালে মই লাগিয়ে ভগিনী নিবেদিতার চুনকাম।

একবার ভগবান বুদ্ধ রয়েছেন শ্রাবস্তীর জেতবনে। একদিন পাদচারণ করতে করতে একটি

কুঠুরির কাছে গিয়ে দেখতে পেলেন এক ভিক্ষু অসুস্থ—উদরপীড়ায় আক্রান্ত, অচৈতন্য। দেখে তিনি শিষ্য আনন্দকে পাঠালেন জল আনতে। স্বহস্তে তাকে স্নান করিয়ে পরিষ্কার করলেন, দুজনে মিলে ধরে নিয়ে এলেন শয্যায়। প্রয়োজনীয় শুশ্রূষার পর অন্যান্য ভিক্ষুদের ডেকে বুদ্ধদেব করুণকণ্ঠে বললেন, ''তোমাদের মা-বাবা কাছে নেই যে তোমরা অসুস্থ হলে তাঁরা সেবা করতে পারবেন। যদি তোমরা একে অন্যের সেবা না কর, তাহলে কে করবে?''

তারপরই তথাগতের উদাত্ত কণ্ঠে বাজল সেই যুগান্তকারী উদ্‌ঘোষণ : ''যে রোগীর সেবা করে, সে আমারই সেবা করে।'' আচার্যের এই কথা সম্বল করেই শত শত বছর বৌদ্ধ সঙ্ঘের ভিক্ষু-ভিক্ষুণীরা আর্তের সেবা করেছেন।

রোগীর সেবা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বৈশিষ্ট্য তার জন্মলগ্ন থেকেই, এবং স্বামীজীর কলম মেনেই। একাজে গুরুভ্রাতা ও শিষ্যদের তিনি উদ্বুদ্ধ করেছিলেন; বড় গর্ব করে পাশ্চাত্যের অনুরাগীকে চিঠিতে জানিয়েছিলেন—তাঁর ছেলেরা কেমন কলেরা-আক্রান্ত পারিয়াদের সেবা করছে। হিমালয়ের অসুস্থ সাধুদের দুরবস্থা দেখে তিনি স্বামী কল্যাণানন্দ ও নিশ্চয়ানন্দকে তাঁদের সেবার্থে পাঠিয়ে দেন। বলা বাহুল্য, শিক্ষাদান প্রভৃতি অন্য সব সেবার মতোই, এরও ভিত্তি শ্রীরামকৃষ্ণের সেইসব যুগান্তকারী কথা : ''মাটির প্রতিমায় পূজা হয়, আর জীবন্ত মানুষে কি হয় না?'', ''চোখ বন্ধ করলেই তিনি আছেন, আর চোখ খুললেই নেই?'', ''জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবের সেবা।''

তথাগত গৃহীদের সুযোগ দিয়েছিলেন নানাভাবে ভিক্ষুসঙ্ঘের সেবা করার। সঙ্ঘের কর্মকাণ্ডের বস্তুগত দিকটি গৃহিসমাজই অনেকাংশে তত্ত্বাবধান করতেন। স্বামী বিবেকানন্দ গৃহীদের ব্যাপকতর সুযোগ দিয়েছেন। ১৮৯৭-এর ১ মে বলরামবাবুর বাড়িতে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠা রামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী ও গৃহী শিষ্যদের নিয়ে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, গৃহস্থ ও সন্ন্যাসীরা একত্রে সমাজদেহকে পুষ্ট করবেন। দেশ ও বিশ্বের কল্যাণের জন্য চাই জনজাগরণ। তার অর্থ জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি। জাগতিক উন্নতির জন্য দরকার শিক্ষা, প্রযুক্তিগত নানান প্রশিক্ষণ। স্বামীজী চেয়েছিলেন, সঙ্ঘ এই উদ্দেশ্যে কাজ করবেন। গৃহীরা তা করবেন সংসারের পথে, সন্ন্যাসীরা ত্যাগের পথে।

নারীসমাজকে সঙ্ঘে স্থান দিয়েছিলেন বুদ্ধদেব। স্বামীজীও ভেবেছেন মেয়েদের জন্য। ভগিনী নিবেদিতা বলেছিলেন, স্বামীজীর সঙ্গে কথা বলে তাঁর মনে হয়েছে—স্বামীজী ভাবতেন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ভবিতব্য চিরকালের জন্য দুটি পথে নির্দিষ্ট—জনগণ ও নারীজাতির সেবা। শুধু শিক্ষাদান নয়, স্বামীজী চিন্তা করেছিলেন শ্রীশ্রীমাকে কেন্দ্র করে মেয়েদের মঠ প্রতিষ্ঠার কথা। বৌদ্ধযুগের ইতিহাস মনে রেখে তিনি নারীমঠকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করতে চেয়েছিলেন। বেলুড় মঠের নিয়মাবলি রচনা করতে গিয়ে প্রথম নিয়মেই তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন নারীমঠ স্থাপনের সংকল্প। তাঁরই অমোঘ ইচ্ছায় আজ গড়ে উঠেছে পৃথিবীর প্রথম স্বাধীন সন্ন্যাসিনী সঙ্ঘ—শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশন।

স্বামীজীর সঙ্ঘভাবনার আরও কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে অপূর্ব সমন্বয় দেখে স্বামীজী চেয়েছিলেন সঙ্ঘের সদস্যদের জীবনেও এই সমন্বয় বিকশিত হবে। জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ—তার পথ মানুষের প্রবণতা অনুসারে চারটি—জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম ও রাজযোগ। এ-চারটি যোগের সুষম সমন্বয় সঙ্ঘের অঙ্গগণের চরিত্রে দেখা যেতেই হবে। এই আদর্শ অতি উচ্চ সন্দেহ নেই। স্বামীজীর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, ব্যষ্টিগুণকে সমষ্টিক্ষেত্রে ব্যবহার করার প্রবণতা।

চারযোগের সমন্বয় সম্পর্কেও স্বামীজীর এমন একটি মৌলিক ধারণা আমাদের চমকিত করে : ''আমাদের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে হয়তো একজনও সেই পূর্ণতা লাভ করতে পারবে না। তবু আমরা পরস্পরের সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদান, ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য বিধান এবং পরস্পরের অভাব পরিপূর্ণ করার মাধ্যমে সমষ্টিগতভাবে এই পূর্ণতা পেতে পারি। এতে প্রত্যেকের জীবনেই সমন্বয়ভাবের প্রকাশ হল না বটে, কিন্তু কতকগুলি লোকের মধ্যে একটা সমন্বয় হল, আর সেটা অন্যান্য প্রচলিত ধর্মমতের থেকে সুনিশ্চিত অগ্রগতি—তাতে সন্দেহ নেই।''

এই সমন্বয়ের ভিত্তিতেই সঙ্ঘের সেবাদর্শ—শিবজ্ঞানে জীবসেবা। এ-আদর্শে, প্রথমত জ্ঞানবিচার করে জীবে শিবে অভেদবুদ্ধি করতে হবে। দ্বিতীয়ত, শিবই জীব এই জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হলে জীবে স্বভাবতই প্রীতি বা ভক্তি হবে। তৃতীয়ত, যার উপর প্রীতি সে যখন অন্নবস্ত্রহীন শিক্ষাহীন অসুস্থ, তার জন্য সেবাকর্ম সহজেই করা যাবে। চতুর্থত অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে সেবাটি নিখুঁত করতে হবে। এভাবে চারটি যোগের সমন্বয় সম্ভব হবে।

এই ভাবভূমির ভিত্তিতেই স্বামীজী সঙ্ঘের আদর্শবাক্য স্থির করেছেন—'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'—নিজের মুক্তি ও জগতের কল্যাণ।

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী স্বামী প্রেমেশানন্দজীর ভাষায় : ''স্বামীজীর idea of a monk হল—সে জ্ঞানবিচারে নিজের বিদেহভাব নিশ্চয় করবে, emotion (ভক্তি) দ্বারা সেই আত্মবস্তুর উপর প্রীতি আনবে, যোগের দ্বারা চিত্তের নিরোধ করবে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিষ্কামভাবে দেহ-মন-প্রাণ সব অনিত্য জেনে জীবের কল্যাণের জন্য তা নিয়োগ করবে।... স্বামীজী চেয়েছিলেন আমাদের এই সঙ্ঘ হবে একটি spiritual research institute—যেখানে লোকে practical religion পাবে। শাস্ত্রের রক্ষা ও প্রচার ব্রাহ্মণের দ্বারা হতে পারে, কিন্তু practice সন্ন্যাসী করে দেখাবে। আমাদের চাই সেই রকম intensity-যুক্ত লোক, যারা science of religion নিয়ে experiment-এ লেগে যাবে, just like any other science।''

বৌদ্ধ সঙ্ঘের লিপিবদ্ধ আভ্যন্তরীণ বিধিনিষেধ আড়াইশোরও বেশি। তুলনায় স্বামীজী-কৃত 'বেলুড় মঠের নিয়মাবলী' অতি সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ। রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলন কোন্ পথে প্রাগ্রসর, তার কার্যধারা, গতিপ্রকৃতি, উদ্দেশ্য, উপায়—সবই রয়েছে তাতে। সঙ্ঘতটিনীর জন্য আগামী সহস্র সহস্র বছরের নদীগর্ভ খনন করে রেখে গিয়েছেন তিনি। সন্ন্যাসীদের লৌকিক বিধিনিষেধের খুঁটিনাটি স্বামীজীকে লিপিবদ্ধ করতে হয়নি। তার কারণ সম্ভবত এই, তিনি পেয়েছিলেন উচ্চশিক্ষিত যুবকদের—সংখ্যায় স্বল্প হলেও তাঁরা অভিজাত, সদ্‌বংশজাত, সাধুজীবন সম্পর্কে জ্ঞান ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন। বুদ্ধদেবের সময় সঙ্ঘ বা সাধুজীবন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা সমাজে ছিল না; তথাগতের দর্শন ও বাণীশ্রবণেই (বহুক্ষেত্রে একবার মাত্র) বিভিন্ন স্তরের মানুষ, বিভিন্ন বৃত্তির শ্রমজীবী, এমনকী নরঘাতী দস্যু, গুপ্তঘাতক, রাজবন্দি, ঋণী প্রমুখও সঙ্ঘে যোগদান করেছিলেন। এঁদের সকলের শিক্ষা (বিদ্যালয়গত ও চরিত্রগত উভয় অর্থেই), মানসিক স্তর, রুচি, অভ্যাস স্বভাবতই ভিন্ন। সঙ্ঘজীবনে প্রবেশ করা মাত্রই তো সেসব সংস্কার নির্মূল হয় না! তাই পিটকগুলিতে দেখা যায়, এক-একটি অনভিপ্রেত ঘটনার প্রেক্ষিতে ভিক্ষুদের বা জনপদবাসীদের অভিযোগ শুনে বুদ্ধদেব এক-একটি বিধি বা নিষেধ রচনা করছেন। এজন্যই ভিক্ষুদের আচরণীয় নিয়মের সংখ্যা অত বেশি!

প্রসঙ্গত সঙ্ঘের আভ্যন্তরীণ নীতি সম্পর্কে আর-একটি কথা। পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন একবার বলেছিলেন, রাশিয়ায় গিয়ে কমিউনগুলি দেখে তাঁর মনে হয়েছে, বৌদ্ধ সঙ্ঘগুলি কমিউনের

মতো; তাদের নিয়মে চলে। কথাটি ভাববার। কার্ল মার্কসের মতানুসারে, সর্বহারা বিপ্লবের পরে প্রথম পর্যায়ে শ্রমিক [অর্থাৎ মানুষ] তার ক্ষমতা অনুযায়ী যতটুকু সমাজকে দিতে পারবে ততটুকুই সে সমাজ থেকে পাবে (receives from society as much as he has given to it)। পরবর্তী পর্যায়ে সে নিজ ক্ষমতা অনুসারে সমাজকে যথাসাধ্য দেবে কিন্তু সমাজ থেকে ততটুকুই পাবে যতটুকু তার দরকার (from each according to his ability, to each according to his needs)। রাহুল সাংকৃত্যায়ন এই দ্বিতীয় পর্যায়ের কথাই বলেছেন। ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে মনে হয়, মার্কসের এই মত সাধারণ স্বার্থপর মানুষের আচরণের সঙ্গে মেলে না। মেলেওনি। এ শুধুমাত্র সন্ন্যাসীর পক্ষেই সম্ভব—নিজের সেরাটুকু সঙ্ঘের জন্য সমাজের জন্য নিংড়ে দেওয়া, অথচ নিজের বস্তুগত প্রাপ্তি তাঁর যৎসামান্য প্রয়োজনটুকুরই অনুরূপ। এক্ষেত্রে, যেমন বৌদ্ধ সঙ্ঘ তেমন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘও—বস্তুত পৃথিবীর সমস্ত সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় এই রীতিতেই চলে।

আমরা আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করি স্বামীজীর সঙ্ঘভাবনা কীভাবে ধাপে ধাপে উঠেছে। ভারতের জন্য তাঁর বহু পরিকল্পনা ছিল। কোনও পরিকল্পনারই রূপায়ণ সম্ভব নয় যতক্ষণ না মানুষ সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করতে পারছে। স্বামীজীর আক্ষেপ ছিল, সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করার ভাবটি আমাদের জাতির ভিতর একেবারে নেই। অথচ দেশ, সমাজ তখনই উন্নত হবে যখন প্রতিটি মানুষ নিঃস্বার্থভাবে সমষ্টির জন্য কাজ করতে পারবে। স্বামীজী বলেছেন, ''বহুর জন্য একের কল্যাণ উৎসর্গ করা কি একমাত্র পুণ্য নয়?... সমাজের জন্য যখন নিজের সমস্ত সুখেচ্ছা বলি দিতে পারবে, তখন তুমিই বুদ্ধ হবে, তুমিই মুক্ত হবে।" অনেকের জন্য নিজের সুখকে বলি দেওয়ার এই ভাবটিই সঙ্ঘভাবনার মূল ভিত্তি। এটি তখনই সম্ভব হবে যখন মানুষ বেদান্তের আত্মতত্ত্বের ভিত্তিতে সকলকে নিজেরই এক-একটি রূপ বলে ভাবতে শিখবে।

স্বামীজী দেখেছেন, সব দেশেই আছে সাম্য আর বৈষম্যের খেলা। এক শ্রেণির মানুষ অপর শ্রেণির চেয়ে স্বভাবতই বেশি বুদ্ধিমান—তাতে সমস্যা ছিল না, সমস্যা এই যে—বেশি বুদ্ধির সুযোগ নিয়ে এরা অন্যদের অধিকার, সুখস্বাচ্ছন্দ্য সব কেড়ে নেয়। এই বৈষম্যকে ধ্বংস করার জন্যই সংগ্রাম। সাম্য আর ঐক্যের দিকে এগিয়ে চলাই কাজ। সাম্য বলতে স্বামীজী অর্থ, শিক্ষা, অন্নবস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদির সম সুযোগকে বুঝিয়েছেন। এই যে আদর্শের ছবি তিনি এঁকেছেন, সেটি কোনও ব্যক্তিমানুষের নয়—এ সঙ্ঘবদ্ধ জাতিরই কাজ। এবং এইভাবে অগ্রসর হয়ে যে-আদর্শ রাষ্ট্র গড়ে উঠবে তার চরিত্র কেমন হবে? স্বামীজীর স্বপ্ন ছিল—আগামী দিনের রাষ্ট্রগুলিতে সম্মিলিত হবে ব্রাহ্মণের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণশক্তি এবং শূদ্রের সাম্যাদর্শ।

তা না হওয়া অবধি শিক্ষিত মানুষের কর্তব্য কী? স্বামীজী উপলব্ধি করেছিলেন, শূদ্র অভ্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী। শূদ্র বলতে তিনি শ্রমজীবী মানুষকে বুঝিয়েছেন। তাদের জাগানোর জন্য যেন শিক্ষিত সমাজ প্রচেষ্টা চালান। স্বামীজী বলেছিলেন, ''বিদ্যাদান জ্ঞানদান করে এদের ঘুম ভাঙাতে যত্নশীল হ। এরা যখন জাগবে—আর একদিন জাগবে নিশ্চয়ই—তখন তারাও তোদের উপকার বিস্মৃত হবে না।" এভাবে স্বভাবতই দেশের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে একাত্মবোধ তথা সঙ্ঘচেতনা জেগে উঠবে।

স্বামীজী আরও এক ধাপ এগিয়ে চিন্তা করেছেন, সমস্ত জাতি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে গড়ে উঠলেও তাদের লক্ষ্য হবে আন্তর্জাতিকতা। সব জাতির ভাল দিকগুলি আত্মস্থ করে জেগে উঠবে বিশ্বমানব। পাশ্চাত্যের কর্মদক্ষতা আর প্রাচ্য প্রজ্ঞার মিলনে সে

হবে পরিপূর্ণ মানুষ। সব কাজই হবে তার কাছে উপাসনা, এবং সে-কাজ তার নিজের জন্য নয়—পরের জন্য। তার প্রতিটি জীবনস্পন্দন পরমার্থের প্রেরণায়। জড়শক্তির উপর তখন চৈতন্যশক্তির আধিপত্য হবে, মানুষের উপর মানুষের অত্যাচার স্বপ্নের মতো মুছে যাবে, সব কাজকে নিয়ন্ত্রিত করবে কেবলমাত্র প্রেম। আ-মেরু সঙ্ঘবদ্ধ এই নতুন পৃথিবীর স্বপ্নই স্বামীজী দেখিয়ে গেছেন।

প্রসঙ্গত মনে করা যায়, ভারতের পুনরুত্থান সম্পর্কে স্বামীজীর ভবিষ্যদ্‌বাণী ছিল : ''ভারত আবার উঠবে—কিন্তু জড়ের শক্তিতে নয়, চৈতন্যের শক্তিতে;... শান্তি ও প্রেমের পতাকা নিয়ে—সন্ন্যাসীর গৈরিক বেশ সহায়ে।'' এ তো স্পষ্টই জগতের বুকে সঙ্ঘের জয়যাত্রার উদ্‌ঘোষণ!

স্বামীজীর অভূতপূর্ব, অতি উদার সঙ্ঘভাবনা জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে সবাইকে আশ্রয় দেয়, ভালবাসে। একমাত্র এই আদর্শই পারে আজকের বিক্ষুব্ধ পৃথিবীকে শান্তির পথ দেখাতে। শ্রীরামকৃষ্ণকে স্বামীজী বলতেন মূর্তিমান প্রেম। আর মিশন শব্দের অর্থ তিনি করেছেন—প্রচার। তাহলে 'রামকৃষ্ণ মিশন' অর্থাৎ সঙ্ঘের অর্থ কী দাঁড়ায়? শ্রীরামকৃষ্ণকে—ওই 'জমাটবাঁধা ভালবাসা'কে প্রচার—যাঁকে আজ পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। প্রেমানন্দজী স্বামীজীর মনোভাব ব্যাখ্যা করে বলতেন, ''ভালবাসায় জগৎ জয় করো—এটাই রামকৃষ্ণ মিশন।''

ভালবাসার দ্বারা—অর্থাৎ তার প্রকাশ সেবার দ্বারা জগৎ জয়ের শুরু পাশের ঘরটি থেকেই। স্বামীজী বলতেন, পূজা শব্দটি ব্যবহৃত হলেই তাঁর ভাবটি যথার্থ ফোটানো যাবে। দয়া নয়, দান নয়, এমনকী সেবাও নয়—পূজা। মানবদেবতার পূজা করে ধন্য হয়ে যাওয়া। এই দৃষ্টিকোণটিই জগতের ধর্মের ইতিহাসে নতুন। ভগবান স্বর্গে নেই, শুধু মন্দিরে নেই—তিনি মানুষের মধ্যে। স্বার্থহীন প্রেম আর সেবাকে সম্বল করে তাঁরই পূজার চেষ্টা করে স্বামীজীর সঙ্ঘ। প্রেমে সে মধুর, শ্রদ্ধায় সে নম্র, নরদেবতার পূজার সুযোগ পেয়ে সে কৃতার্থ।

শ্রীরামকৃষ্ণ আর স্বামীজী একই সত্তা। স্বামীজীর স্বীকৃতি : ''যে-শক্তি আমার পশ্চাতে থেকে কাজ করছে, তা বিবেকানন্দ নয়—তা স্বয়ং প্রভু।'' সঙ্ঘের প্রত্যক্ষ আশ্রয়ে যারা আছি—গৃহী বা সন্ন্যাসী—তারা কেউ তরঙ্গ, কেউ বা বুদবুদ, কিন্তু সকলেরই আধার অনন্ত মহাসাগর—পুঞ্জীভূত-শক্তি সঙ্ঘ। সে-সঙ্ঘ 'স্বয়ং প্রভু'। আমাদের সব অক্ষমতা-ক্ষুদ্রতাকে দলিত মথিত করে চিরমহিমময় শাশ্বত পরমসত্তা। তিনি আছেন বলেই আমাদের অস্তিত্ব, আমাদের শক্তি, আমাদের পূর্ণতার আশ্বাস, আমাদের মূল্য। শ্রীরামকৃষ্ণ। আমাদের সব শূন্যের আগে—এক।

শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী মহারাজের কৃপায় 'নিবোধত' ৩৫ বর্ষে পদার্পণ করল। 'পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা।' বিগত বর্ষে পত্রিকা হারিয়েছে তার রূপকার ও ৩৪ বছর ব্যাপী সম্পাদিকা প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণামাতাজীকে। বিশ্বজোড়া অতিমারির ফলেও সে নানান সমস্যার সম্মুখীন। তবু 'যুগ-যুগ ধাবিত যাত্রী।' স্বামীজী তাঁর পতাকা নমিত হতে দেন না। তাঁর কৃপায় অচিরেই পত্রিকা সংকটমুক্ত হবে—এ আমাদের বিশ্বাস। এই ক্রান্তিলগ্নে পাঠক, লেখক, গ্রাহক, মুদ্রক, বিজ্ঞাপনদাতা, পৃষ্ঠপোষক, স্বেচ্ছাসেবক, শুভানুধ্যায়ী—সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সপ্রীতি নমস্কার। জগজ্জননী সকলের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ করুন, এই প্রার্থনা। —সম্পাদিকা